Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.157-167
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শ্রী অরবিন্দের দার্শনিক ধ্যান ধারণা

হারু মার্ডি

সহকারী অধ্যাপক, কাটোয়া কলেজ, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Rishi Aurobindo emerged as a pioneer in the early 19th century. He observed in his philosophical thought that there is nothing identical between Indian and Western thought. Although these two are considered opposites, there is no difference between them. So he wanted to try to reconcile these two. He mentions spirituality in his thinking. Later he reconciled materialism and spiritualism. This refers to the Atmanas situated in spirituality. By superhuman level he meant – the knowledge of truth.

Keywords: Spiritualism, Materialism, Integral yoga, Maya, Lila, Supermind.

ভূমিকা: শ্রী অরবিন্দের দর্শনচিন্তার স্পষ্ট রূপটি আমরা দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। যদিও তার অনেক আগেই তিনি শুরু করেছিলেন অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমদিকে। তাঁর মনে দর্শনচিন্তা গভীর ভাবে নাড়া দেয়। এই নতুন যুগে যারা পথিকৃৎ তারাও মনে করতেন ভারতীয় জীবন দর্শন তার শত সম্ভার থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দর্শনের মতোই একধারে অবস্থিত। দুটি দর্শনই বিপরীতমুখী। তাই তারা চেয়েছিলেন এ-দুয়ের সমন্বয় তাদের চিন্তাধারায়। তারা মনে করতেন সমস্ত ভারতীয় চিন্তার শেষ লক্ষ্য ছিল সমস্ত মোক্ষ নামক এমন এক পুরুষার্থ যেটা হচ্ছে নিতান্তই ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু তাই নয়, এমনকি ব্যক্তি জীবনেরও মধ্যে উপস্থিত দেহ, প্রাণ এবং মনোজগতের কোন অস্তিত্ব নেই। এই সকলের উর্দ্ধে তিনি আধ্যাত্মিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। অরবিন্দ মনে করেন, যখন আত্মা জাগ্রত হয় এবং জীবন ও মনকে পরিচালিত করতে এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয় তখন তা সচেতন জীবনে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে দেখা যায় মঙ্গল, সত্য, সৌন্দর্য এর মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক আত্মাকে খোঁজে। এই আধ্যাত্মিক আত্মা হচ্ছে বিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম, উচ্চ এবং মহান। তাঁর মতে, আত্মা এই সংযোগ অর্জন কতে সচেষ্ট হয়ে যে চিন্তার মধ্যে দিয়ে তা হল 'মন'। এই 'মন'ই হল আধ্যাত্মিকতার যন্ত্র। এর ফলে দেখা যায় বুদ্ধি, উচ্চমন এবং স্বজ্ঞাজাত বুদ্ধির উপর মানসিক চাপ পড়ে, এর ফলে আত্মার অভিমুখের পরিবর্তন ঘটে। অরবিন্দের মতে, এই রূপান্তর যত বেশি বিশুদ্ধ ও পূর্ণ ততই আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ মন ও আকার এবং গঠনের সহায়ক ভালো ও মন্দের ধারণা, সত্য ও মিথ্যার

ধারণা, সৌন্দর্য ও কুৎসিতের ধারণা অতিবর্তী হবে। এই ধরনের আধ্যাত্মিক চেতনা সমস্ত রকম দ্বৈততাকে অতিক্রম করে যায় এবং একত্বকে প্রকাশ করে।

জড় ও আত্মা: শ্রী অরবিন্দের 'দর্শন' এর সমগ্র কাঠামোটি যে মূল ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে তাহল 'আত্মা' এবং 'জড়' উভয়েই হচ্ছে সত্য - এদের প্রকৃত সমন্বয় সাধনের মধ্যে দিয়েই যথার্থ দার্শনিক উপলব্ধি সম্ভব। শ্রী অরবিন্দ জানতেন 'জড়বাদ' এক 'আধ্যাত্মবাদ' দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব এই জগতকে নিজের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছে এতদিন। জড়বাদীরা যেমন 'আত্মা'কে মনের কল্পনা বলে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করেছে, তেমনি পক্ষান্তরে আধ্যাত্মবাদীরাও আবার এই জড় জগতকে মিথ্যাস্বপ্ন ও কল্পনামাত্র বলে অবজ্ঞা করে এসেছে। সেই দিক থেকে শ্রী অরবিন্দের দর্শন হল এই দুই এর সমন্বয়। 'দিব্যজীবন' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন - পৃথিবীতে দিব্য জীবনের উপলব্ধি ততক্ষণ সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, দেহের প্রাসাদের মধ্যেই চিরন্তন আধ্যাত্মশক্তির বাস। শ্রী অরবিন্দের মতে, জড়বাদীদের কাজ হচ্ছে সহজ। তারা আধ্যাত্মসত্তাকে অস্বীকার করে সহজেই ঘোষণা করে জড় এবং গতির অদ্বৈতবাদ, তবে এই জড়বাদী অদ্বৈতবাদ বেশি দিন কার্যকরী হয় না। কেননা জড়বাদীদের সমস্ত জ্ঞানের নির্ভরতা শুধু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের উপর। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এলাকা এবং প্রয়োগ খুবই সীমিত। যেসব বস্তুকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না তাদের মূল্য অর্থহীন। কিন্তু আধুনিক জড়বাদীরা দাবী করেন যে, তাদের তত্ত্বের পেছনে বিজ্ঞানের সমর্থন আছে। সেইজন্য জড়বাদকে বলা হয় অনিবার্যভাবেই বিজ্ঞান প্রকৃতি সম্পন্ন।

কিন্তু শ্রী অরবিন্দ মনে করেন, বৈজ্ঞানিক সমর্থন জড়বাদীদের আধ্যাত্মতত্ত্বের অস্বীকৃতিকে সমর্থন করেন না। এমন কি আমাদের 'বুদ্ধি' যদিও জড়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য হয় না এবং সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে পরিনামে কম-বেশি 'তাত্ত্বিক গঠন' এ আশ্রয় নেয় - যা প্রকৃতপক্ষে সেটা জানার যোগ্যই নয়। এমনকি 'বিজ্ঞান' এর ওপর জড়বাদী দিক থেকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আরো মৌলিক বিষয়, 'বৈজ্ঞানিক আত্মা'কে উপেক্ষা করা হয়েছে।

শ্রী অরবিন্দের মতে 'সত্তা' বা reality-কে 'সচ্চিদানন্দ' বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে 'সত্তা' বিষয়ক বর্ণনায় তিনি জড়বাদ ও আধ্যাত্মবাদের সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি বলেছেন 'জড়'কে যদি অস্বীকার করা হয় তবে বাস্তব জীবনে তাৎপর্য থাকবে না। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বলেছেন জড়বাদীর পক্ষে তাঁর তত্ত্বের অর্থবহতার জন্য, আত্মা বা আধ্যাত্মিকতা স্বীকার করা জরুরী নয়। তবে শ্রী অরবিন্দ মনে করেন, জড়বাদীর আত্মাকে অস্বীকারের বিষয়টি শেষ বিচারে অসংগত ও স্ব-বিরোধী।

এই আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অরবিন্দ অতিমানস এর উল্লেখ করেছেন। অতিমানস স্তর হল সত্যের অধিকারী। এর জ্ঞান হচ্ছে সত্যেরই জ্ঞান - কেবল মাত্র মানসিক জ্ঞানের মতো ছবি বা চিহ্ন নয়। সাধারণ মন ও অতিমানসের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় আছে, যাদের মধ্যে দিয়ে অতিমানস, সাধারণ মনে নেমে আসতে পারে এবং সাধারণ মন ও ক্রমশ অতি মানসের উচ্চস্তরে আরোহন করতে পারে। এটাই বিবর্তনের নিয়ম। সাধারণ চেতনার উর্দ্ধে উচ্চতর মানসিক চেতনার যে স্তর আছে তা মাঝে মাঝেই সাধারণ চেতনাতে বোঝা যায়।

শ্রী অরবিন্দই প্রথম দার্শনিক যিনি অন্তর্দৃষ্টিসঞ্জাত প্রতীতি এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির বিশ্লেষণ থেকে বিশুদ্ধ, সার্বিক এবং অসীম শক্তিরূপে সৎ এর ধারণায় উপনীত হয়েছে। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, যখন আমরা

নিজেদের ব্যক্তিগত অহংকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে অনুসন্ধিৎসুর জিজ্ঞাসা নিয়ে বাসনাবিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ অবলোকন করি, তখন প্রাথমিকভাবে আমাদের এক সীমাহীন শক্তির অনুভব হয় যে শক্তি অসীম দেশ ও অনন্তকালে নিরন্তর ক্রিয়া করে চলেছে। আমরা এই 'সৎ' এর ক্রিয়াকে প্রথম দৃষ্টিতে অনুভব করি আমাদের অস্তিত্বের পটভূমিতে। ফলে উদ্ভব হয় এক দ্বৈতবাদের যেখানে জ্ঞাতা হিসাবে আমরা নিজেদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারণ করি। কিন্তু পরবর্তী স্তরে অভিজ্ঞতার ওপর বৌদ্ধিক ক্রিয়া শুরু হয় এবং পূর্ববর্তী চিত্রটি পরিবর্তিত হতে থাকে। বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট পটভূমি থেকে 'বিশুদ্ধ সৎ'-কে দেশ-কালের চিন্তা ছাড়াই ভাবা যায় এবং দেশ-কালের চিন্তা আচ্ছাদিত (তিরোহিত) হলে দেশ-কাল ভাবনার দ্বারা সৃষ্টি দ্বৈতবাদের অবসান ঘটে।

পরমাত্মায় সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটির বৈশিষ্ট্য এক এবং অভিন্ন হিসাবে বর্তমান থাকে – সত্তাই সেখানে চিৎ, চিৎই আনন্দ। প্রকাশের উচ্চতর পর্যায়েও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অবস্থায় থাকে, তবে কোনটি বেশি বা কোনটি কম স্পষ্ট হতে পারে। স্বরূপতঃ অবিচ্ছেদ্য হলেও প্রকাশের নিম্নতর স্তরে বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। অবভাসিক জগতে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি অন্যগুলো থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান বলে প্রতীতি (খ্যাতি) হওয়ার জন্যই আমরা 'অচেতন অস্তিত্ব' বা 'বেদনাদায়ক অস্তিত্ব' জাতীয় শব্দবন্ধ ব্যবহার করি। 'চিৎ' কোন জড় বা নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব নয়। এর মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি 'তপস' নিহিত থাকে যা জগৎপ্রকাশের সময় চঞ্চল ও সৃষ্টিধর্মী 'শক্তি' হয়ে ওঠে, 'চিৎ-তপস্' 'চিৎ-শক্তি' (সর্বব্যাপী চেতনা শক্তি) রূপে আবির্ভূত হয়।

প্রকৃতির যে বিবর্তন প্রত্যক্ষযোগ্য, প্রকৃতি যেভাবে দেহী থেকে দেহীর জন্ম, দেহের মধ্যে চেতনার উন্মেষ সম্ভব করে চলেছে – সেসব পর্যবেক্ষণ করেই উপরিউক্ত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু 'পুনর্জন্ম' এমন একটি অ-পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনা যার মাধ্যমে বিবর্তিত অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবাত্মার অগ্রগতি ঘটে চলেছে। এই অগ্রগতির পর্যায়েও, এমন কী মানুষের মধ্যেও, চেতনসত্তা এখনো তার কারণগুলোর দ্বারাই, অর্থাৎ মন-প্রাণ-দেহ দ্বারা, আবৃত থাকে, পুরুষ এই পর্যায়েও প্রকৃতির অধীন থাকে।

অরবিন্দের মতে, ব্রহ্ম হতে প্রকাশিত হওয়ার কালে দুটি রূপ পরিগ্রহণ করে – পুরুষ (বা চেতনসত্তা বা আত্মা) এবং প্রকৃতি। সাধারণ মানুষের মধ্যে পুরুষ 'অহং' এবং প্রকৃতি দ্বারা আবৃত থাকে। পুরুষ যখন এই আবরণ ছিন্ন করে প্রকাশিত হতে থাকে তখনই মুক্তির (Liberation) পর্যায় শুরু হয়। প্রকৃতি আপাত দৃষ্টিতে অচেতন এবং যান্ত্রিক শক্তিচালিত বলে মনে হলেও এর পিছনে সব সময় দৈব চেতনা এবং দৈবশক্তি উপস্থিত থাকে। মন-প্রাণ এবং জড় সমন্বিত প্রকৃতিকে 'নিম্নতর প্রকৃতি' বলা যায়, এবং এক 'উচ্চতর প্রকৃতি' (বা পরাপ্রকৃতি)-ও আছে যাকে 'সচ্চিদানন্দের প্রকৃতি' বা 'অতিপ্রকৃতি' (Super Nature) বলে। এই পরাপ্রকৃতি 'অতিমন'-কে (Super Nature) প্রকাশ করতে পারে। পরাপ্রকৃতি অজ্ঞান থেকে মুক্ত।

দিব্যজীবন: শ্রী অরবিন্দের মতে 'দিব্যজীবন' হল পরম নিয়তি, একে আমাদের অবিদ্যাগ্রস্ত সাধারণ মানসিক জীবনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে এক অর্থে নব জীবন হবে মানবজীবন ও চেতনার বর্তমান বিধির একেবারে বিপরীত। আমাদের সাধারণ জীবনে আমরা বিশ্বাস করি যে আনন্দ ও অনুশোচনা, আপদ ও আবেগ, সুখ ও দুঃখ, সাফল্য ও ব্যর্থতা, ভাগ্যের অনিশ্চয়তা, জীবন সংগ্রাম ও বৈরিতা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ - এই সকলই বিশ্বের অপরিহার্য ও ঐকান্ত দিক। এর থেকে ভিন্ন কোনো জীবন আমাদের অচিন্তনীয়। যে জীবন চিত্রে-এগুলি অঙ্কিত হয় না, সে জীবন শূন্য, এমনকি অবাস্তব রচিতও বটে। তিনি আরো বলেছেন

মানব জীবন যদি জড় থেকে আকস্মিক ভাবে উৎপন্ন হতো অথবা ঈশ্বরের ভ্রম কিংবা খেয়াল খুশির ফলে জীবনের উদ্ভাব হতো তবে তাৎপর্যহীন হয়ে যেত। জড় জগতের ক্রিয়ার মধ্যে এক বিপুল দঢ় চেতনা সক্রিয় - এটাই ক্রমে মানব চেতনায় প্রকাশিত হয়েছে। মানবজীবন অলীক মায়া নয়, বরং জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে এক শাশ্বত সত্যের এর প্রকাশ ঘটেছে প্রতিনিয়ত- আর মানবজীবন সেই সত্যের পূর্ণ প্রকাশ। তাঁর মতে 'দিব্যজীবন' হল বিবর্তনের চরম লক্ষ্য। এই দিব্য জীবনের মাধ্যমে জগৎ চেতনা এবং জগৎ কার্যকে সঙ্গে নিয়ে আসে। এরূপ জীবনে ব্যক্তি আনন্দের চেতনা নিয়ে তার কার্য সম্পন্ন করে। তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে আত্মার প্রকাশ থেকে আনন্দ উপভোগ করা তার কোন কামনা থাকে না, চাহিদা থাকে না। কোন কিছু অর্জন করবার জন্য সে সচেষ্ট হয় না এমনকি আনন্দ তার লক্ষ্য নয় এটি হলো তার প্রকৃতি। অরবিন্দ বলেন, 'দিব্যজীবন' মন এবং দেহকে তাদের বাইরে এক বৃহত্তর ও উচ্চতর সত্তায় সমন্বিত করে। অর্থাৎ জীবনের, মনের এবং দেহের শক্তি এই জীবন বা দিব্যজীবনে অবদমিত হয়ে পড়ে। শ্রী অরবিন্দের মতে একটি আন্তর জীবন ব্যতিরেকে এগুলি অসম্ভব। মানুষের দেবত্ব তার নিজের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাই কোন একটি বাহ্যিক প্রকাশ ঐ আন্তর দিকটির যথার্থ স্বরূপ তুলে ধরতে পারে না। ব্যক্তিকে নিজেকে দর্শন করতে হবে। তার যথার্থ সত্তাকে অন্বেষণ করতে হবে। ব্যক্তি তা করতে পারে অন্তর্মুখী জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে এই নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু দিব্যজীবনে অন্তর্মুখী হওয়া স্বাভাবিক বিষয় হয়ে ওঠে।

শ্রী অরবিন্দ মনে করেন দিব্য চেতনায় উত্তীর্ণ হতে হলে মানুষের কর্তব্য পারিপার্শ্বিক বিষয়ের সঙ্গে আধ্যাত্ম ও ব্যবহারিক সম্পর্কের পূর্ণতা সাধন। এজন্য প্রয়োজন বিশ্বের সকল বিষয় ও প্রাণীর সঙ্গে একাত্মতা। শুধু কতগুলি বিচ্ছিন্ন পূর্ণ বিকশিত জীবন নয়-বহু বিজ্ঞানময় পুরুষের দ্বারা এক নতুন জাতির আবির্ভাব। এখন প্রশ্ন হল বিজ্ঞানময় পুরুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল সত্য কি এক ধরণের হবে? তাদের আচরণের কি কোন নির্দিষ্ট ধরণ থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর সদর্থকভাবে দেওয়া যায় না, এ কারণে যে, অতিমানস বিধি-বৈচিত্রের মধ্যে এক পূর্ণ ঐক্যের নির্দেষ্টা, তাই বিজ্ঞানময় চেতনা প্রকাশ অনন্ত বৈচিত্র্যমূলক, যদিও এই চেতনা, এর ভিত্তি, এর গঠন, এর সর্বপ্রকাশ ও সর্ব সংযোজনমূলক ক্রমের দিক থেকে অভিন্ন। তিনি আরো দিব্যজীবনে উল্লেখ করে বলেছেন এ যদি সত্য হয় যে, মৃৎশক্তির মধ্যেই চিৎ-শক্তি রয়েছে সংবৃত্ত হয়ে, এই প্রকৃতি সেই গুহায় দিব্য পুরুষেরই আভাস মাত্র। তাহলে দিব্য ভাব কে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা, অন্তরে বাইরে সেই দিব্য পুরুষের অনুভবকে মুক্ত করাই হবে সত্যমানবের চরম পরুষার্থ। এই দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখি তাহলে মানুষের প্রাকৃত দেহেই যে নিহিত আছে অ-প্রাকৃত দিব্য জীবনের শাশ্বত সম্ভাবনা, মার্জিত বুদ্ধির কাছে একথা তার প্রহেলিকা মনে হয় না।

শ্রী অরবিন্দ বলেন প্রাকৃত, জগতে বহু বিষয় মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়ও কিন্তু তাই বলে সেগুলিকে অজ্ঞেয়ও বলা সঙ্গত নয়। তাঁর দর্শনে জড় কোনভাবে অবহেলিত হয়নি। জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন সমস্ত জিজ্ঞাসার চরম অঙ্কে দেখা দেয় অজ্ঞেয়বাদের একটি ছায়া। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে এক অজ্ঞেয়তত্ত্বের প্রতীক বা প্রতিভাস এক অবিজ্ঞেয় বস্তুকেই আমরা জড়, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি রূপে দেখি তবে চরম তত্ত্বকে অজ্ঞেয় বলার অর্থ এই নয় যে, তা সবরকমের চেতনার বাইরে। প্রকৃত অর্থ যে আমাদের চিন্তা ও ভাষা দিয়ে তাকে ধরা যায় না। ভাষা বিষয়-বিষয়ীর ভেদ সৃষ্টি করে। বিষয়কে খন্ডিত ও সীমিত করে। অথচ চরম সত্তা হচ্ছে অভেদ, অখন্ড আত্মস্বরূপ।

বর্তমান সামাজিক জীবন বহুলাংশে কৃত্রিম লাভ-লোকসান কোষে একত্র থাকার সুবিধার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিজ্ঞানময় সমষ্টি জীবনে সকলকে নিজেদের একই আত্মার অংশীদার। এক সত্যের ভিন্ন পুরুষ বলে জানবে। সকলের মধ্যে থাকবে ঐকোবোধ। অহংবোধহীন অতি মানসিক জীব অনুভব করবে একই চিৎশক্তি ক্রিয়া করে চলেছে তাদের সকলের মধ্যে-তারা কেবল যন্ত্রমাত্র। বর্তমান মানব জীবনের প্রচলিত অনেক কিছুই দিব্য জীবনে থাকবে না। বিভিন্ন মানবিক আদর্শ, সংসার নীতির বিরোধী অন্তর্নিহিত হবে একের প্রতি অন্যের হিংসা, ধ্বংসাত্মক নিষ্ঠুর যুদ্ধ ও স্বার্থ-প্রণোদিত অসাধু পঙ্কিল রাজনৈতিক সংঘর্ষের স্থান নেই। দিব্য জীবনের শিল্প কলা থাকবে কিন্তু এসবের চর্চা হবে প্রাণে প্রকৃত প্রকাশের জন্য-অবসর বিনোদনের জন্য নয়। এক দিব্য সত্যই জীবনের নানা দিক দিয়ে প্রকাশিত হবে মানুষ যখন দিব্য জীবন লাভ করবে।

অখণ্ড যোগ: অখণ্ড যোগ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রী অরবিন্দ। এখানে তিনি 'অখণ্ড' যোগ বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন খণ্ড নয়, এবং 'যোগ' কথাটির মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে তিনি চিত্রবৃত্তি নিরোধ এর কথা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যোগের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ ঘটে। কিন্তু অরবিন্দ যোগ বলতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনকে বোঝাতে চাননি, তাঁর মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন নয়। জীব ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র। এই কারণেই অরবিন্দ যোগকে 'অখণ্ড যোগ' বলেছেন। একই সঙ্গে তিনি 'দিব্য জীবন' এর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দিব্য জীবন হল বিবর্তনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল এই দিব্য জীবনকে কিভাবে পৃথিবীতে নিয়ে আসা যাবে? এর উত্তর হিসাবে তিনি বলেন – জগতের বুকে একদিন দিব্য জীবন নেমে আসবেই সেটা হতে পারে তাড়াতাড়ি (দ্রুত) বা বিলম্বিত। তাঁর মতে আধ্যাত্মিক কার্যক্রম এর মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে দ্রুত কার্যকরী করা সম্ভব বলে মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন 'যোগ' এর মাধ্যমে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। বুদ্ধি, অহংকার ও মন – এই তিনিট তত্ত্বকে একত্রে যোগদর্শনে 'চিত্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। এই চিত্ত যখন কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন চিত্ত সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় – ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন ঘটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন চিত্ত ঘটের আকার গ্রহণ করে অর্থাৎ চিত্তের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ঘটের আকার সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়। চিত্তের বৃত্তি হল এই প্রকার জ্ঞানরূপ অবস্থা সকল। আত্মা স্বরূপতঃ হচ্ছে বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাই চৈতন্যে বিকার সম্ভব নয়।

মায়া ও লীলা: বস্তুতঃ এই শব্দ দুটি 'কিভাবে' এবং 'কেন' জগৎ সৃষ্টি তার উত্তর দেয়। যদি প্রশ্ন হয় কেন সৃষ্টি হয়েছে জগৎ ? উত্তর হবে, চিৎ পুরুষের লীলার জন্য। যদি প্রশ্ন হয় কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে ? তবে উত্তর হবে, মায়ার দ্বারা। যদিও আপাতভাবে এর থেকে মনে হতে পারে এটি তো বেদান্তেরই উত্তর। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ঠিক বেদান্তের মত করে বিষয় দুটিকে ব্যাখ্যা না করে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রী অরবিন্দের মতে, সৃষ্টি আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, আনন্দই হল অস্তিত্বের কারণ, আনন্দই জন্মের শেষ। উপনিষদ বলে – আনন্দ থেকেই সমস্ত সত্তার জন্ম আনন্দের দ্বারাই বুদ্ধি, আনন্দের সঙ্গেই নিষ্ক্রমণ। তাই বলা যায় সৃষ্টি এক আনন্দের খেলা – লীলা মাত্র। যে জগতের আমরা অংশ, সেই জগত আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় 'গতি' রূপে আবার এই 'গতি' আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় সচেতন সৃষ্টিশীল হিসাবে যা নতুন নতুন আকৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা এই গতির উদ্দেশ্য এবং এইসব আকৃতির কারণ বোঝার চেষ্টা করি, তখনই আমাদের উপলব্ধি হয় এই মহা জগতের ছন্দকে – যা

আনন্দেরই প্রকাশ। আর তখনই আমরা এর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি। জগৎ পদ্ধতির এই আনন্দকেই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলা যায় লীলা।

'দিব্যজীবনে' (পৃ.৯৪) তিনি বলছেন, '...জগৎ সত্তাকে যদি জানি শাস্বত সন্মাত্রের স্বরূপানন্দের ভূমিকায় রেখে, তাহলে তাকে দেখব বলব ও অনুভব করব লীলা বলে। নিখিলের 'বন্ধুরাত্মা' যে চিরকিশোর, এ বিশ্বলীলায় তিনিই 'শিশু ভোলনাথ'। তিনিই নটরাজ, তিনিই কবি, তিনিই দ্রষ্টা। - তাঁরই অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস হিল্লোলিত হয়ে চলেছে রূপে রূপে। আত্মরূপায়ণের অহেতুক উল্লাসে নিজের মধ্যেই নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি, অক্লান্ত ছন্দোলীলায়। এ আনন্দ মেলায় তিনিই নট, তিনিই নাট্য, তিনিই নটরঙ্গ।'

'মায়া' সাধারণত দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থে এটি শক্তি বিশেষ, গঠনমূলক এবং সৃষ্টিমূলক, আর দ্বিতীয় অর্থে ভ্রম সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া বিশেষ। শ্রীঅরবিন্দ দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেননি। কেননা তাহলে এই জগতের অবস্থান ভ্রমাত্মক হয়ে যাবে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন এই জগৎ অসত্য নয়, এমনকি যদি এটি স্বপ্নও হয়, তবে সেই স্বপ্নও সত্যি। তাই বলা যায় শ্রীঅরবিন্দ 'মায়া'র প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। যেখানে বলা হচ্ছে মায়া হল এমন শক্তি যা জগৎ সৃষ্টি করেছে, যা সচ্চিদানন্দের শক্তি হিসাবে অসীম সত্তার আকৃতিগুলিকে প্রকাশ করছে। একে 'দিব্য মায়া' বলা যায়। এখানে সকলকে 'সকল' বলেই জানা যায়,কোন বিভেদকে চেতনা থাকে না। যেখানে প্রত্যেকের সকলে এবং সকলের মধ্যে প্রত্যেকে থাকে, যেখানে সত্তার সঙ্গে সত্তা থাকে, চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্য, গতির সঙ্গে গতি, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, অরবিন্দের দর্শনে চরম তত্ত্ব হলেন শক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিজে সৎস্বরূপ, আর শক্তি হচ্ছে মূলতঃ চিৎস্বরূপা। উভয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি। সৃষ্টিতেই আনন্দ। শক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম এই আনন্দস্বরূপের আকার। এই জন্যই শ্রী অরবিন্দ পরমতত্ত্বের আখ্যা দিয়েছেন সচ্চিদানন্দ। ব্যক্তিমানব এবং জগত এই সচ্চিদানন্দেরই পরিণাম, অতএব তা থেকে অভিন্ন। উপনিষদ-গীতা-বেদ-বেদাঙ্গ-তন্ত্র-পুরাণ-মন্ত্রক এগুলি শ্রী অরবিন্দ ভারতীয় অদ্বৈত দর্শন বলেছেন। প্রতীচ্যের অনেক মণীষীও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। প্রাচ্যেই হোক প্রতীচ্যেই হোক, যারা তা করেননি তাঁরা, কি ব্যক্তিমানব কি সমষ্টি মানব, কারুর কল্যাণের প্রকৃত হদিশ দেননি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। ঘোষ, চরণ গোবিন্দ, 'সমকালীন ভারতীয় দর্শন', প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০২০, কলকাতা-৭০০০৭৩।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, প্রথম প্রকাশ: ২৯শে শ্রাবণ, ১৪১১, ইং- ১৫ই আগষ্ট, ২০০৫, কলকাতা-৭০০০০৬।

৩। ঘোষ, পীযূষকান্তি, মিত্র, কুমার, 'সমকালীন দর্শন', প্রথম প্রকাশ: ১০ই জুন ২০০২ - ২০০৩, কলকাতা-৭০০০০৯।

৪। ঠাকুর, এন, এম, সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন, প্রথম প্রকাশ: ২০১৯ - ২০, কলকাতা-৭০০০০৯।

৫।রায়, কুমার দিলীপ, শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যার্টার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩।